প্রতিধ্বনি **the Echo**

A journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

অভিজিৎ সেন এর 'মেঘের নদী': বাস্তবতার নানা মাত্রা

তানিয়া চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Abstract

Abhijit Sen is one of the prominent narrative writers in Contemporary Bengali literature. He is one who has stood ideologically against the inheritance of colonial model in the Bengali narrative world both in terms of form and content consciousness. Off and on, in his writings, Sen has criticized the trend of writing stories of love & sex only in Bengali fiction and pointed out that so called mainstream literature only depicts the life of growing middleclass and rich people, ignoring the struggle for existence of the common mass, their livelihood. Like Debesh Roy, Abhijit maintains the European model of novel is not useful for depicting the heterogeneity of the reality of life of the larger section of people. He says, like the Third World literature, our narrative is to stand politically and ideologically against neo-colonial attack over the heterogeneous culture of marginalized mass and for this. The present day narrative should be emancipated from the domain of time-space contactless middleclass centric story writing, and it should take the way of re-evaluating & re-constructing of myth, folktales & traditions to represent the present day reality. Depiction of reality, in Sen's idea is a protest against the traditional way of misrepresenting time & space. When we go through a narrative discourse of Abhijit Sen,we should be conscious about the narrative consciousness of the writer can be termed as post-colonial and post-modern in Indian and Bengalee sense, otherwise, the reader may fail to find the path of entry in the narrative world of Sen, and also will not be able to understand the ideological protest against all kind of hegemony, be it in federal productive relation or in the domain of politics & culture.

We want to prepare a critical discourse on Abhijit Sen's novel 'Megher Nodi' from post-colonial and post-modern viewpoint of literary criticism.

অভিজিৎ সেনের রচনার প্রধান অবলম্বন সাধারণ মানুষ। তাঁর সমকালীন কিছু লেখক যেমন ভগীরথ মিশ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মত অভিজিৎও শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক। শোষণমূলক ব্যবস্থা, অর্থাৎ মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ এই বিষয়টি অভিজিতের কথাসাহিত্যে নানাভাবে উঠে এসেছে। একদিকে তাঁর 'রাজপাট-ধর্মপাট' উপন্যাসে লেখক চৈতন্য আন্দোলনকে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করেছেন, কেননা যে শ্রেণীহীন সাম্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষে চৈতন্যদেব আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা অভিজিৎকে প্রাণিত করেছে। আবার অন্যদিকে 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে শোষণের আরেক ভিন্নতর রূপ। এই উপন্যাসটির একদিকে যেমন রয়েছে আধিপত্যবাদী শক্তির দ্বারা রহুর দলের উৎখাত হওয়ার কাহিনি, অন্যদিকে ফুটে উঠেছে প্রবল শক্তিমান colonizer রা কীভাবে রহুর দলের সংস্কৃতিকে গ্রাস করছে তারই আখ্যান। নয়া-উপনিবেশবাদের সংস্কৃতির রাজনীতিকে অভিজিৎ এখানে অনাবৃত করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

অভিজিৎ সেনের বিভিন্ন উপন্যাসে কোনো না কোনোভাবে হাজির হয়েছে কৃষিজীবন। লেখক বড় দরদের সঙ্গে কৃষক জীবনকে তাঁর রচনায় তুলে ধরেন। তাঁর 'হলুদ রঙের সূর্য' উপন্যাসে তিনি উদ্বাস্ত কৃষকদের যে কঠোর সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন, সেই সংগ্রাম কেবল একটি বাড়ি, উদ্বাস্তর নতুন ঠিকানা কিংবা দুবেলার অন্নসংস্থানের সংগ্রাম নয় বরং এর মধ্যেদিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্বকেই নতুনভাবে দাঁড় করাতে চায়, যে অস্তিত্ব রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাদের নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। পূর্ব পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে তারা হিন্দু এই অপরাধে আক্রান্ত হয়, আবার ভারতবর্ষে অখণ্ড দেশের মানুষ হওয়া সত্বেও নিজের দেশেই চিহ্নিত হয় উদ্বাস্ত নামে। এই জায়গাতে তার যে আত্মপরিচয় অর্জনের সংগ্রাম, এতে একদিকে উঠে আসে কৃষকদের সাধারণ জীবন, অন্যদিকে তেমনি একটা সাংঘাতিক অস্তিত্বের সঙ্কটও আভাসিত হয়। অভিজিত এই অস্তিত্বের সংকটের গোড়া ধরে নাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে অভিজিৎ সেনের আরও দুটি রচনা 'বর্গক্ষেত্র' এবং 'দেবাংশী' তেও কৃষক জীবনের নানা প্রেক্ষিত আলোকিত হয়েছে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

অভিজিৎ সেনের রচনার প্রধান অবলম্বন হলো গ্রাম। আর গ্রামীন অর্থনৈতিক মূল বৈশিষ্ট্য কৃষিকেন্দ্রীকতা। তাই লেখকের গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যাবস্থার মধ্যে কৃষিকেন্দ্রীক জীবনের বাস্তব অবস্থা, কৃষিজীবি মানুষ বা কৃষিশ্রমিকদের নানাভাবে নিগৃহিত হওয়ার কাহিনি বর্নিত হয়েছে। আলাদা করে অভিজিৎ সেনের কয়েকটি উপন্যাসকে কৃষিকেন্দ্রীক উপন্যাস বলা কষ্টকর। তবুও গবেষণার স্বার্থে আমরা উপন্যাসের মূল theme বা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কিছু বিভাজন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই বিভাজন নিতান্তই কৃত্রিম। কেননা অভিজিৎ সেনের সমস্ত রচনাই কম বেশী কৃষিজীবন, কৃষকজীবন এবং যে শোষণ-শৃঙ্খলা কৃষকের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে, মূলত এইসমস্ত বিষয়ভিত্তিক। ‘মেঘের নদী’ উপন্যাসটিতেও এভাবে কৃষক ও কৃষিজীবনের নানা প্রেক্ষিত ওঠে এসেছে। ‘মেঘের নদী’ উপন্যাসটি নানাকারণে কৃষক জীবনকেন্দ্রীক হওয়া সত্বেও কৃষকজীবন, কৃষিকেন্দ্রীক শোষণব্যবস্থা, শোষণের জাতাকালের বর্ননার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি। বেশ কয়েকটি জটিল বিষয় অভিজিৎ এই উপন্যাসে স্পর্শ করেছেন। ফলে উপন্যাসটির অবয়বে তৈরী হয়েছে বেশ কয়েকটি তল (surface), প্রতিটি surface এ জীবনে বাস্তবের স্বরূপ ভিন্ন, আর সবগুলি একই আখ্যানের পাত্রে উপস্থাপিত হওয়ায় ‘মেঘের নদী’ নামের ছোট্ট উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের উদ্বাস্ত কৃষকজীবনের সাদামাটা বাস্তবচিত্রণ হয়েই থাকে নি, বরং তা সময়ের inner structure এ যে জটীল তন্ত্রসমূহ বিরাজমান তার সবগুলোকেই চিহ্নিত করেছে। দেশ-কাল সংলগ্ন জীবন বাস্তবের বহুরেখার কাটাকুটিতে এই আখ্যান প্রকৃত প্রস্তাবে বহুরৈখিক বাস্তবের এক polyphony হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের কোনো এক জেলা সদরের জেলা পরিষদের একটি সভার কার্যবিবরণী রয়েছে। সংক্ষিপ্ত এই কার্যবিবরণীটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুস্বরিক। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের স্বরূপ, কৃষি ব্যাবস্থায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা, রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকা, ইত্যাদি নানা বিষয় অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে হাজির হয়েছে উপন্যাসে। অভিজিৎ দেখাচ্ছেন দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে পড়েছে

দায়িত্বজ্ঞানহীন। ফলত লোকসভা, বিধানসভা ইত্যাদিতে জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত আইন এবং পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তা বাস্তবায়নে কারও তেমন দায় নেই। জেলার মহকুমা শাসক, যিনি একজন দায়িত্বশীল, স্থানীয় কর্মকর্তা; একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়নের প্রধান চালক তিনি। কিন্তু তিনিই ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য, স্থানীয়ভাবে নীতিনির্দেশনার জন্য যে মিটিং হয় তাতে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন বোধ করেননা। যিনি সরকারের আমলা হিসেবে জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিত্ব করেন সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দু-এক দিন আগে পথ অবরোধ মোকাবিলা করতে গিয়ে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ফলত তিনি খানিকটা লজ্জিত হয়ে আছেন। তার এই লজ্জার কথা কেউ যদি কোনো ভাবে জেনে ফেলে এই ভয়ে তিনি এই সভা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চান। সামগ্রিক ভাবে উন্নয়নে ব্যাঙ্ক এর যে ইতিবাচক ভুমিকা রয়েছে তা ব্যাঙ্ক এর অফিসারদের কথাবার্তায় পরিস্ফুট হয় না। অর্থাৎ কোনো পক্ষেই কোনো আন্তরিকতা নেই। আর যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে এরা কেউ সভায় আহুত হয় না। মহিম শিক্ষিত, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষক বলেই এই সভাগুলিতে আমন্ত্রণ পায়, কিন্তু সাধারণ কৃষকের প্রতিনিধি সেই সভায় ডাক পায় না। এখানে এই সভার প্রতিবেদনের মাধ্যমে অভিজিতের কলম যেন এই প্রশ্ন তুলতে চায়, তাহলে সত্যিকারের উন্নয়ন হবে কি করে? অভিজিতের একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি নিজে সরাসরি সমাজের বা system এর সমালোচনা করেন না, কিন্তু নিরপেক্ষতার আড়ালে থেকে তিনি ঘটনাকে এমন ভাবে তুলে ধরেন যাতে প্রকৃত বাস্তব ছবিটা উঠে আসে, এবং পাঠক অন্তত সমালোচনা করবার জায়গায় পৌঁছে যান। পাঠকের চেতনাকে এইভাবে অভিজিৎ আঘাত করেন।

অন্যদিকে এই উপন্যাসে উঠে এসেছে সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে NGO (Non-government organization) বা বেসরকারী সংস্থাগুলির বাড়বাড়ন্ত হয়ে ওঠা রূপ। নয়া উপনিবেশবাদী বিশ্বায়ন যা প্রায় ৮০/৯০ এর দশকে জন্ম লাভ করেছে এবং এর পর থেকেই সারা পৃথিবীতে এই NGO র একটা বিশেষ ভুমিকা চোখে পড়ছে। এই সংস্থাগুলির প্রধান কাজ হচ্ছে নানাভাবে fund জোগাড় করে তথাকথিত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে

এগিয়ে আসা। কিন্তু এর সাথে এগুলোর একটি ব্যাবসায়িক লক্ষ্যও থাকে। যার কিছু আমরা পেয়েছি আধুনিক কিছু লেখকদের রচনায়। এরকমই একটা লক্ষ্য করি ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে দেখা গেছে যে 'ইস্ট ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশন' নামক আমেরিকান এক NGO, যা লোকসংস্কৃতির চর্চা, প্রসার, গবেষণা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে এবং তা করতে গিয়ে সেই অঞ্চলের গবেষক রাজীবকে তার দালাল বা আড়কাঠিতে পরিণত করে। আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে মধ্যবিত্ত রাজীব ক্রমশ হয়ে ওঠে ফাউণ্ডেশনের স্থানীয় কর্মকর্তা। ভগীরথ মিশ্র লক্ষ্য করেছেন আমেরিকান সংস্থাটির কর্মকৌশল। গ্রামের সহজ সরল মেয়েদের নাচ, গান দেখিয়ে, তাদের নানা stage দেওয়ার নামে এরা কোটি টাকা রোজগার করছে। ভগীরথ এভাবেই অনাবৃত করেছেন NGO র নেতিবাচক ভুমিকা। 'মেঘের নদী' উপন্যাসে অভিজিৎও খুব হালকাভাবে এই NGO সমূহের ভূমিকার ওপর একটা সন্দেহের ভাব ব্যক্ত করেছেন। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্যোতির্ময় রায়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে NGO তে যুক্ত হওয়া এবং মহিমের মত একজন উদ্যোগী, পরিশ্রমী মানুষকে তার কর্মকাণ্ডে সামিল করার জন্য এত উৎসাহ দেখানোর মধ্যে কোথাও যেন রয়েছে একটা স্বার্থের চোরাটান। মহিমের সাথে তার মাষ্টারের কথোপকথনের একটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

> ''যদি সত্যিকারের কাজ করতে চাও, গ্রামীণ মানুষের যথার্থ উন্নয়নের কাজ করতে চাও, আমাদের সঙ্গে যোগ দেও।.....স্বেচ্ছাসেবা কেউ করতে বলছে না তোমাকে। তুমি যা করছ তাই কর, যেখানে করছ, সেখানেই কর। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে কর। তুমি এন.জি.ও কর। টাকার অভাব হবে না।সারা পৃথিবী এইসব কাজের জন্য টাকা দিচ্ছে। ইদানিং আমাদের সরকার ও বেসরকারি সংগঠনকে নানা উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য ডাকছে। এন.জি.ওরা পৃথিবীতে রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিকল্প শক্তি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত রকমের মঙ্গলই আমাদের কাম্য।'' [১]

এভাবেই কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির প্রবেশ ঘটছে, সামন্তবাদের মধ্যে পুজিঁর অনুপ্রবেশ ঘটছে। এই পুঁজির অনুপ্রবেশ কৃষকদের জন্য এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে যে কৃষকেরা পরিশ্রম করে উৎপাদন করবে, তারা তাদের উৎপাদিত ফসল নিজেরা বাজারজাত করতে পারবে না, তা NGOর মাধ্যমে বাজারজাত হবে যার ফলে লাভও হবে এই সংস্থাগুলিরই। অর্থাৎ নতুন রকমের একটা প্রজা শোষণের, কৃষক শোষণের ব্যাবস্থা আসছে এই NGOর যত্রতত্র গজিয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে, অভিজিৎ সেন স্পষ্ট ভাবে না হলেও ইঙ্গিতের মাধ্যমে এই শোষণের ব্যাপারটাকে পাঠকের সামনে তুলেছেন।

'মেঘের নদী' উপন্যাসটি শুধুই কৃষকের জীবনের শরিক উপন্যাস মাত্র নয়, এই উপন্যাসে যে সিংহভাগ মানুষ উঠে এসেছে তারা প্রধানত বঙ্গভাষী বাঙালি চরিত্র যারা প্রায় সবাই হচ্ছে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। এই নমঃশূদ্ররা আমাদের বাঙালি হিন্দু সমাজে বাঁশ-বেতের কাজ করে, মৎস চাষ করে, কেউ আবার কৃষিজীবী, বলা ভালো কৃষিশ্রমিক। অর্থাৎ এদের পেশাগুলির কোনটাই তেমন অর্থকরী নয়। অন্যদিকে শূদ্র বর্গের মধ্যেও এরা নিন্দিত ও নিচু অবস্থানে বাস করে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয় তখন নমঃশূদ্র সমাজের কিংবদন্তী নেতা যোগেন্দ্র মণ্ডল পাকিস্তানকে সমর্থন করেন। এটা যেন, যে হিন্দু Identity তাকে সারাজীবন অসম্মান করেছে, তার বিরুদ্ধে এক ধরণের প্রতিবাদ। কিন্তু এতে যে তার জাতের খুব উন্নয়ন হয়েছিল তা নয়, বরং ব্যাক্তি যোগেন মণ্ডলের কিছু লাভ হয়েছিল, তা সত্যি। তিনি ক্রমশই একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রীড়নক এ পরিণত হয়েছিলেন, উত্তরকালে তিনি পাকিস্তানের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। উপন্যাসে যোগেন্দ্র মণ্ডলের প্রসঙ্গ আছে। যাইহোক, এই নমঃশূদ্র জাতের লোকেরা খুব পরিশ্রমী এবং স্বভাবতই এদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রোধ কিছুটা বেশী। মূলত পরিশ্রমের যথাযোগ্য মূল্য না পাওয়ায়ই তাদের মধ্যে এই ক্রোধের জন্ম হয়েছে। এরা অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ জাতি। আর এই জাতির একজন দেবোপম ব্যাক্তি হলেন দেবেন বিশ্বাস। দেবেন বিশ্বাস উদ্ধান্ত নমঃশূদ্র সমাজের নেতা। পূর্বপাকিস্তান থেকে সর্বহারা হয়ে আসা স্বজাতীয় লোকেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠান, তাদের নিয়ে জনপদ গঠন, তাদের অন্নসংস্থান, তাদের নতুন দেশে নতুন ভাবে থিতু করাই জীবনের

একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছেন দেবেন বিশ্বাস। মহিমের সাথে অসুস্থ দেবেন বিশ্বাসের আলোচনায় রয়েছে এর প্রমাণ,

> ‘‘যে সব মানুষ দণ্ডকারণ্য, আন্দামান কিংবা আসামে হারিয়ে গেছে, আমাদের গোষ্ঠীর সব মানুষ, সবাইকে খুঁজে নিয়ে আসব। এখানে তাদের ঘর করে দেব, জমি করে দেব।’’[২]

দেবেন বিশ্বাস যথার্থ অর্থেই একজন গোষ্ঠী নায়ক। তাঁকে সকলে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, মানে। তিনি স্কুল গঠন করেছেন। তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরা যাতে পড়াশুনা করতে পারে, যাতে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এই চেষ্টাটা তিনি করেছেন। যদিও এটা খুব পরিষ্কার না যে এই সমস্ত কাজ করার জন্য উদ্যমের সাথে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তা উদ্বাস্ত দেবেন বিশ্বাস কোথা থেকে জোগাড় করেছিলেন? তবে উপন্যাস থেকে একথা অনুমান করা যায় যে সম্ভবত তিনি নমঃশূদ্র সমাজের বিত্তশালী পরিবারেরই লোক ছিলেন। আর সেই সাথে লোকটির মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠালাভের লোভটাও ছিল কিছু কম। শুধু এটা নয়, এর পাশাপাশি ব্যাক্তিজীবনেও তিনি কিছু অনুশাসন মেনে চলতেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজে যৌনতা, যৌন সম্পর্ক, অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে এতটা স্পর্শকাতর নেই, যতটা তথাকথিত উচ্চবর্গীয়দের মধ্যে রয়েছে। এর প্রমাণ আমরা তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যেও পেয়েছি। কিন্তু দেবেন বিশ্বাস একেবারেই পিউরিটান মানসিকতার লোক ছিলেন। তিনি তাঁর শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য নিজেকে যথাসম্ভব এ সমস্ত ব্যাপার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন, এবং পুত্র মহিমকেও এই পরামর্শই দিয়েছেন।

মহিম দেবেন বিশ্বাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী। সে সমস্ত মানুষকে নিজের সাথে নিয়ে চলতে চেয়েছে। সে রাজনৈতিক নেতা হতে চায়নি। সে একজন নতুন entrepreneur, সে দেশসেবক নয়। তাই সে মাস্টারকে বলে,

> ‘‘চাকরী করিনি, একথা ঠিক নয় স্যার। পাশ করার পর বেশ কিছুদিনের চাকর খুঁজেছি। করবার মত উপযুক্ত চাকরি পাই নি। আর আমি ঠিক গ্রাম উন্নয়নের কাজ করছি না স্যার। গ্রামাঞ্চলে যে সব কাজে পয়সা আছে, সেই সব কাজ আপনাদের কাচ থেকে শেখা বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে শুরু করেছি। যদি সফল হই

অনেক মানুষ উপকৃত হবে। আমারও রোজগার হবে। স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার মতো তো পারিবারিক অবস্থা আমার নয় স্যার।”[৩]

এই কাজ, এই চেষ্টা করতে গিয়ে সে তার গোষ্ঠির এবং গোষ্ঠির বাইরের বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কিন্তু সরকারি লালফিতার বাঁধন যে কীভাবে মহিমের মত মানুষের পরিশ্রমী কর্মকাণ্ডকেও অনেকসময় বিফল করে দিতে পারে এর প্রমাণ রয়েছে ‘মেঘের নদী’ উপন্যাসে। মহিম তার সমস্যা নিয়ে প্রত্যেকটা ব্যাঙ্ক এ গেছে। ব্যাঙ্ক এর নিয়ম মতে মাছ মারার সময় হল ফাল্গুন মাস, তাই প্রবল খরায় জ্যৈষ্ঠ মাসেই জলের অভাবে মাছ মরতে শুরু করলেও মাছ তুলে বিক্রি করা চলবে না। এদিকে মহিমের টাকা বাকি পরে আছে ব্যাবসাদারদের কাছে, তাকেও টাকা দিতে হবে অনেকের। এমন অবস্থায় বাস্তবের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাবস্থার চাপে মহিম হারিয়ে ফেলছে তার আত্মবিশ্বাস। উৎপাদনের শৃঙ্খলায় ক্রমশই ঘুণ ধরছে যথার্থ ব্যাবস্থাপনার অভাবে। মহিম তার শ্রমিকদের টাকা দিতে পারছে না, ব্যাবসাদাররা তার পাওনা টাকা দিচ্ছে না, অন্যদিকে ব্যাঙ্ক এর কিস্তিতে সে নিজেই দিতে পারছে না। চাপের মধ্যে আছে মহিম। এই চাপটা সৃষ্টি হয়েছে মূলত যথার্থ পরিকল্পনার অভাবে। উপন্যাসের মিটিংটা এখানে খুব জরুরী। লেখক প্রথমেই বলেছেন যে ‘সভা না বলে মিটিং বলা ভালো’। সভার মধ্যে একটা বড় ব্যাপার থাকে অর্থাৎ সভায় প্রচুর মানুষের অংশগ্রহণের ব্যাপার থাকে। আর মিটিং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের যান্ত্রিক উপস্থিতি ও ততোধিক যান্ত্রিক এজ্যান্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

মূলত কৃষক জীবনের সমস্যা সংকট, পরিকল্পনাবিহীন উন্নয়ন এবং এই পরিকল্পনাবিহীন উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন কাজকর্ম গ্রামাঞ্চলে কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এর বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসটিতে। জনজীবনের সঙ্গে একবারেই সম্পর্কহীন রাজনৈতিক কর্তাব্যাক্তিরা কীভাবে কাগজে পত্রে উন্নয়ণ করে নিচ্ছেন এবং যার ফলে মহিমের মত কর্মদ্যোমী মানুষের কর্মযজ্ঞও বিফলে যাচ্ছে শোষণের মধ্যে পরে মহিমের মত উদ্যমী মানুষ, শিক্ষিত ছেলেও চাপ সামলাতে পারছে না উপন্যাসটির এটি একটি প্রধান বিষয়। আর এই বিষয়টির উপন্যাসে

দাড় করানোর ক্ষেত্রে একটি সমস্যার দিক রূপে দেখা দিয়েছে যৌনতা। এই যৌনতা এসেছে একটি ধর্ষণের ঘটনা, একটি পরিস্থিতিগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই ঘটনাটির বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন কীভাবে বেদনার্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন মহিমের খুলে রাখা শার্টের পকেট থেকে টাকা চুরির করার লোভে ঘরে ঢোকে পোলিয়াদের মেয়ে উত্তরা, যে মহিমের খামাড় বাড়িরই এক ঠিকে ঝি বা কর্মচারী। টাকাটা নিতে সে সংকোচ করছে, ভয় পাচ্ছে, আর এই অবসরেই জেগে গেছে মহিম। জেগে সে চোর ধরেছে। চোর ধরতে গিয়ে সামান্য বিদ্ধস্ত হয়েছে উত্তরার পোশাক। আর এর পরই ঘটছে মহিমের কর্তৃক উত্তরাকে ধর্ষণের ঘটনা। এই ঘটনাকে উপন্যাসের প্রায় প্রধান রূপে দেখাচ্ছেন লেখক। এটা কি একেবারেই উদ্দেশ্যহীন ভেবে? অভিজিৎ সেনের রচনায় দেখা গেছে যে সমস্যাকে একটি অন্যমাত্রা দেওয়ার জন্য লেখক ব্যবহার করেছেন যৌনতাকে। যৌনতা, যৌনদৃশ্যের বর্ণনা এগুলির বর্ণনায় লেখক ইঙ্গিতে বিশ্বাসী নন, বিবরণে বিশ্বাসী। অথচ বিবরণের মধ্যে এমন একধরণের ভাষিক সংযম থাকে যে দীর্ঘ বর্ণনা সত্ত্বেও তা পর্ণগ্রাফির স্তরে পোঁছায় না। এও লেখকের একটা রচনার কৌশল। এই কাম, যৌনতা, এসবকে এতটা বর্ণনা না করলেও লেখকের উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধি ঘটত বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে যৌনতার এই অতিকথিত প্রসঙ্গ যে লেখকের রচনার দুর্বলতা তাও বলা যায় না। কেননা তা কখনই হয়ে ওঠে না।

অভিজিৎ সেন মহিমকে ব্যক্তিচরিত্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনে, মহিম যে দেবতা নয় একথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে তোলার প্রয়োজনে, মহিমেরও যে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতই চাহিদা রয়েছে তা দেখানোর জন্য মহিমের এই কাজটিকে একধরনের যুক্তিগ্রাহ্যতার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লেখক এক অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছেন এখানে। তিনি বলেছেন মহিমের সারা জীবন ধরে নিম্নশ্রেণীর মানুষ হয়ে থাকার যন্ত্রণার কথা-

> ‘‘সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধের আকাঙ্খা সারা জীবন ধরে বাঙালিক উচ্চবর্ণের কাচ থেকে পাওয়া তার সূক্ষ্ম ও স্থূল ঘৃণা, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রাপথে সংরক্ষণ সুবিধার জন্য পাওয়া শ্লেষ, অপমান, ক্রোধ, বিগত তিনমাসের যৌন যাত্রাপথে সংরক্ষণ সুবিধার জন্য

ক্রমবর্ধমান খরা ও উজ্জীবিত দাবদাহ তার শরীর ও মনে এমন এক বিচিত্র আলকেমি সৃষ্টি করল যা তার জাগ্রত চেতনাকে, তার আত্মশাসনকে এবং দেবেন বিশ্বাসকে পর্যুদস্ত করে ফেলল। তার নিজেকে মনে হল স্বেচ্ছাচারের অধিকার অর্জন করা এক প্রবল ব্যাভিচারি।"[৪]

এখানে যেন উপন্যাসের কথক তাঁর নায়কের রক্ষা করার জন্যই এমন যুক্তিজাল রচনা করেছেন। এখানে আরেকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ আসতে পারে। মহিমের মত কাজসর্বস্ব মানুষের নেপালী মহিলার বাড়িতে যাওয়া কেন? এই ঘটনাটি আসলে পরবর্তী ঘটনাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যই উপন্যাসে এসেছে। এই আধা দেবতা, আধা অবতার মহিমও যে রক্তমাংসের দোষে গুণে মিলে একটি মানুষ তাই যেন লেখক এখানে দেখাতে চাইছেন। তাইসে বন্ধু গুইন্দুর সাথে উপস্থিত হয় সেই নেপালী মহিলার ঘরে। সেই মহিলার দিকে আকৃষ্ট হয়ে মহিম যখন তার কাছে যেতে অগ্রসর হয়, তখন সে আয়নায় দেখতে পায় দেবেন বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। এ শুধুই দেবেন বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি নয়, এ দেবেন বিশ্বাসের শিক্ষা, সংস্কার, দায়িত্ববোধ। দেবেন বিশ্বাস তাকে শিখিয়েছেন, সমাজ নেতাকে সাধারণ মানুষের মত চললে হবে না, তাই যখনই বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে একটু উত্তেজনা, একটু অবৈধতার দিকে মানুষের প্রাণের স্বাভাবিক ঝোঁকবশত অগ্রসর হয়েছে মহিম, তখনই তার সামনে তর্জনী তুলে হাজির হয়েছেন দেবেন বিশ্বাস। এ তারই বিবেক দংশনের প্রতিচ্ছবি।

লেখক মহিম চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে বারবার এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সে কোনো ইউটোপিয়া বা অলীক-অবাস্তব-স্বপ্নময় চরিত্র নয়, সে মানুষ। মহিম চিত্ত দুর্বল এক যুবক, যার দুর্বলতার একটি বিশেষ দিক আছে। নারীর স্তনের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ সারাজীবনে, তার উপর পত্নীর গর্ভাবস্থায় তার সাথে স্বাভাবিক দূরত্ব, সারাদিনের পরিশ্রমে বিভ্রান্ত অবস্থা, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তার স্বপ্নের বর্ণনা এসমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে যৌনতার অনুসঙ্গ। সব মিলিয়ে দেবেন বিশ্বাস পরাভূত হয়েছেন। এখানে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি অভিজিৎ সেনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এই ধর্ষণের ঘটনাটিকে সমর্থন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? উপন্যাসটি সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে পড়লে দেখা

যায়, গোটা ব্যাপারটি অভিজিৎ ব্যাবহার করেছেন অন্য একটি উদ্দেশ্যে, অন্য একটি ব্যাপার উপন্যাসে নিয়ে আসার জন্য।

প্রথমত এই ঘটনাটি দরকার একটি সমস্যাকে চিহ্নীত করার জন্য। উত্তরা ধর্ষিত না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে ধর্ষিত হলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াত না। মেয়েটি পোলিয়াদের হওয়া দরকার, মেয়েটি রাজবংশীদের হওয়া দরকার, কেননা উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি আন্দোলনকে আখ্যানের ক্রনোটপে তুলে আনতে হবে, চেষ্টা করতে হবে তার যথার্থ স্বরূপ সন্ধানের। এই দায় সমাজ-সচেতন লেখক অভিজিৎ সেনের। সারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের প্রধান সমস্যা হল Identity বা অস্তিত্বের সন্ধান। প্রত্যেকটা ছোট ছোট জনগোষ্ঠী তার অস্তিত্বকে পুনরুদ্ধার করতে চাইছে, এবং যখন দেখছে যে তার সংস্কৃতি, তার স্বাতন্ত্র্য, তার ভাষা, তার আত্মপরিচয় কোনোও না কোনোও ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিবেশী ক্ষমতাশালী শক্তির দ্বারা, তখন তারা স্বতন্ত্র রাজ্য চাইছে, স্বতন্ত্র অঞ্চল চাইছে, কখনও চাইছে গোটা রাষ্ট্রও। ডিমাসা, মার, রিয়াং, চাকমা সকলেই অর্থাৎ উত্তর-পূর্বভারতের বিচিত্র জনগোষ্ঠী আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধারের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে, যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে। এই আন্দোলনের প্রক্রিয়া, এই জাতিগঠনের প্রক্রিয়া post-colonial জাতি গঠনের প্রক্রিয়া রূপে চিহ্নিত হতে পারে। এই উত্তর পূর্ব ভারতের জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় কোচ বা রাজবংশীরাও নিজস্ব অভিজ্ঞান বা আত্মপরিচয়ের সন্ধানে ব্রতি হয়েছেন। আক্রাসু (All Assam Koch Rajbansi Students Union) আমাদের পশ্চিম আসামের এক প্রবল শক্তিমান ছাত্র সংগঠন। এই সংগঠনই পশ্চিমবঙ্গে কামতাপুরি নামে খ্যাত। কোকড়াঝার অঞ্চল সহ গোয়ালপাড়ার একটা অংশ নিয়ে, বাংলাদেশের রংপুর থেকে বিহারের পুর্ণিয়া পর্যন্ত এবং গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক হারে রাজবংশীদের বাস। এই রাজবংশীরা আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে অসমিয়া, আবার শিলিগুড়িতে-কোচবিহারে-দিনাজপুরে-মালদাতে নিজের বাড়িতে, স্বভূমিতে তারা বাঙালি পরিচয়ে বাস করে। অথচ তারা মোঙ্গলয়েড, আর বাঙালি হচ্ছে অস্ট্রিক মিশ্রিত জনগোষ্ঠী। এই কামতাপুরি আন্দোলনটিকে এক অন্য মাত্রা দেবার জন্য ঘটনাটিকে তুলে আনা হয়েছে উপন্যাসে। প্রথমে এই পোলিয়াদের মেয়ের ধর্ষণের বর্ণনা, তারপর ব্রজেন রায়ের বৃত্তান্ত। কত কত

বাঙালি মানুষ ইউনিয়নের নামে কাজ করে না, কিন্তু বিচার হলে চাকরি যায় কেবল রাজবংশী ব্রজেন রায়ের। তিনি দেখাচ্ছেন রাজবংশীরাও নির্যাতিত। অভিজিৎ তাই বলে কোন জাতি-গোষ্ঠীর বিচ্ছন্নতাকে সমর্থন করেন না, কিন্তু এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতটি রচনায় তুলে ধরে তিনি দেখাতে চাইছেন যে স্পর্শকাতর সময়ে একটি সাধারণ ঘটনা, একজন পুরুষের দ্বারা নারী নির্যাতন মাত্র হয়ে থাকে না, বরং হয়ে যায় বাঙালি পুরুষের দ্বারা রাজবংশী নারীর উপর আক্রমণ। রাজবংশী সমাজ তাই বন্ধ ডাকে, রাস্তা অবরোধ করে, বিদ্রোহ করে। এই ভাবে গত বিশ বৎসর ধরে চলতে থাকা রাজবংশীদের স্বতন্ত্র কোচ রাজ্যের জন্য আন্দোলনের ছবি উঠে আসে উপন্যাসে। এই বিষয়টি উপন্যাসে স্থান পাওয়ায় এটি কেবল কৃষক জীবন ভিত্তিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি, পেয়েছে নতুন মাত্রা। উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে বাস্তবতার আরেকটি তল, সে মহিমের পৌরুষে মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু মহিম যখন তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরলো, তখন মেয়েটির মুখ থেকে একটি আর্ত চিৎকার (মহিমের যা 'শীৎকার' বলে মনে হয়েছিল) ব্যাতিত আর কোন আওয়াজই বেরোল না, এবং তার পর থেকে গোটা উপন্যাসে জুড়ে মেয়েটি বোবা হয়েই থাকল। উপন্যাসের পরাপাঠে উঠে আসলো নিম্নবর্গের ধর্ষিতা মেয়ের অভিযোগ শোনবার কান আমাদের সভ্য রাষ্ট্রের আজও তৈরি হয়নি। উত্তরাকে কেন্দ্রে রেখে আখ্যানটির একটি নারীচেতনাবাদী ভাষ্য রচনা করাও সম্ভব। অন্যদিকে মহিমের স্ত্রী মনিমালার প্রসঙ্গটিও এখানে উঠে আসতে পারে, উত্তরা অশিক্ষিত, আদিবাসী মেয়ে। কিন্তু মনিমালা ত শিক্ষিত, রাজ্যের শিক্ষক নিযুক্তির পরীক্ষায় সে উর্ত্তীর্ণ হয়েছে ভালোভাবেই। ধর্ষক, বিশ্বাসঘাতক স্বামীর সাথে আর থাকতে পারবে না বলে স্কুলে চাকরি নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবার কথাও বলে মনিমালা। কিন্তু পরমুহুর্তেই সুজাতা দিদিমনির মুখে,

> ''তা ছাড়া তোদের ছেলে আছে। তার কাছে ভবিষ্যতে জবাবদিহি করতে হতে পারে।''[৫]

এই সামান্য কথায় সে দমে যায় কেন। নারীর এই অবদমন আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বহুমুখী শোষণেরই ফল।

যাইহোক, মহিমের কেস নিস্পত্তি হয় সম্ভবত দশ-পনেরো হাজার টাকায়। কিন্তু একথা জানা বাকী থেকে যায় যে, উত্তরা কি আদৌ ভয়

পেয়েছিল, সে আদৌ কি চেয়েছিল? আমাদের সমাজে প্রান্তিক নারীর অবস্থান কোথায়? তাঁকে নিয়ে রাজনীতি হয়, রাস্তা অবরোধ হয়, তাকে কেন্দ্র করেই চতুর্থ বর্গের কর্মচারী সমাজের নেতা হয়ে ওঠে, তাকে নিয়ে বিশাল বক্তৃতা হয়, কিন্তু মেয়েটির আওয়াজ আর শোনা যায় না, মেয়েটির মুখ আর দেখা যায় না। নানান রকমের বার্তার মধ্যে দিয়ে শোষণমূলক সমাজের নানা অনাচারকে অনাবৃত করার চেষ্টা করেছেন লেখক তাঁর এই 'মেঘের নদী' উপন্যাসে। উপন্যাস ছোট্ট পরিসরে বাস্তবতার একটা বহুমাত্রিক ছবি হয়ে উঠেছে। এখানেই অভিজিতের সার্থকতা। অভিজিৎ একটা গল্পে কেবল নিটোল গল্পই বলেন না, কেননা শুধুমাত্র কাহিনি গ্রন্থনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি সেই গল্পটি কার্যকারণ সূত্রে গেঁথে তাঁর একটা নির্দিষ্ট পরিণতি দানও তাঁর দায় নয়। তাই কাহিনির শেষে মহিম-মনিমালা কি হল তা জানা যায় না, যদিও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, অর্থাৎ পোলিয়া মেয়েটি উপযুক্ত বিচার পায় না, এমন ইঙ্গিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গল্পটি শেষ করার দায়িত্ব লেখক নেন না।

'মেঘের নদী' কে উপন্যাস না বলে একটা বড় গল্পই বলা যেতে পারে। কিছু কিছু narration দীর্ঘ তাই আকারে কিছুটা বড় হয়েছে। একদিকে কামতাপুরি আন্দোলন, একদিকে প্রান্তিক নারীর অবস্থান, পাশাপাশি সমাজে মধ্যবিত্ত নারীর অবস্থান এইভাবে নানা দিক থেকে বাস্তবতার নানা মাত্রা এই উপন্যাসটিতে ধরা পরেছে। আমরা দেখেছি যে অভিজিৎ কেবল কাহিনিই বলেছেন না, বরং কাহিনির অন্তর্বয়নে দেশ-কালের যথার্থ বাস্তবতাকেই প্রতিবিম্বিত করেছেন। লেখক তাঁর রচনায় সময়ের অর্ন্তবৃত বাস্তবতার সকল মাত্রাকেই অনাবৃত করার চেষ্টা করেন। অত্যন্ত সময় সচেতন লেখক তিনি। তাঁর রচনার উপজীব্য বিষয় হল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ। এই বিষয়টাকেই আমরা বোঝার চেষ্টা করব আমাদের গবেষণার মধ্য দিয়ে। বাস্তবতা সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে। বাস্তব কীভাবে নির্মিত হয়, তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যিকেরা বাস্তবকে কীভাবে নির্মাণ করেন। তাঁর কাছে বাস্তব মানে অজস্র খুঁটিনাটি ঘটনার সমাহার। শ্রেণী ভিত্তিক সমাজে একনতুন বাস্তবতার প্রচার করেন অভিজিৎ সেন। আর তাঁর এই বাস্তবসম্বন্ধীয় ভাবনার সার্থক উদাহরণ হল তাঁর 'মেঘের নদী' উপন্যাস।

তথ্যসূত্র-

১. অভিজিৎ সেন – ‘মেঘের নদী’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা জানুয়ারী ২০০৫, পৃষ্ঠা – ৬৭
২. অভিজিৎ সেন – ‘মেঘের নদী’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা জানুয়ারী ২০০৫, পৃষ্ঠা – ১৭
৩. অভিজিৎ সেন – ‘মেঘের নদী’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা জানুয়ারী ২০০৫, পৃষ্ঠা – ৬৭
৪. অভিজিৎ সেন – ‘মেঘের নদী’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা জানুয়ারী ২০০৫, পৃষ্ঠা – ৭৪
৫. অভিজিৎ সেন – ‘মেঘের নদী’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা জানুয়ারী ২০০৫, পৃষ্ঠা – ৮৬